নয় এ মধুর খেলা

সাবর্ণি চট্টোপাধ্যায়

‘যেখানেই যশ, সেইখানেই নিন্দা, সংসারের ইহাই নিয়ম। পৃথিবীতে যিনি যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায় বিশেষ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন।’ — দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা এই কথাটি বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেন হুবহু মিলে যায়। সাহিত্য সাধনার প্রায় শুরু থেকেই সমালোচনা-নিন্দা-আক্রোশ-মতান্তর-মনান্তর-বিদ্বেষ-ব্যক্তি আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। তিনি ভাগ্যগুণে যেমন জীবনে প্রশংসা ও স্তুতিবাদ পেয়েছিলেন, তেমনি দুর্ভাগ্যবশত নিন্দা-অপবাদ-অখ্যাতিও জুটেছিল তাঁর।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ মোকাবিলা করার বা বিরুদ্ধাচরণের পথে না হেঁটে এসব থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। শুধু কখনও আঘাত পেলে কদাচিৎ সেটা জানিয়েছেন পত্রালাপে, কখনও জানিয়েছেন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়; কিন্তু কখনোই সংঘাতে যাননি, এড়িয়ে থেকেছেন তাঁর রুচি, সংযম, সৌজাত্য, সহিষ্ণুতা ও কৌলীন্য দিয়ে।

তবে রবীন্দ্রনাথ একা নন। যে কোনও ভাষার সাহিত্যেই লেখকরা সমালোচিত হয়েছেন দেশ-কাল-যুগ নির্বিশেষে। আমাদের ভারতবর্ষে তো ভবভূতির যুগেও সাহিত্য-সমালোচনা ছিল। কারণ ভবভূতি বলছেন — ‘কেহ কেহ যাহারা নাকি ইহার প্রতি [অর্থাৎ তাঁহার রচনার প্রতি] অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাহারা কোনও কিছু জানে কি? আমার এই প্রযত্ন তাহাদের জন্য নহে। আমার সমানধর্মী জন্মিবে এবং আছেও, এবং কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুলা।’ একদিকে তিনি সাহিত্য-সমালোচকদের এক-হাত নিয়েছেন, অন্যদিকে বিনয়ও দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই ঐতিহ্যর ধারেকাছে ছিলেন না।

লেখক-সমালোচনা মূলত হয় নতুন পুরনো দ্বন্দ্বে। নতুন-পুরনোর চিরাচরিত এই বিরোধের জেরে ইংল্যাণ্ডের কীটসকে নির্মম সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল, যা ছিল এক ধরনের আক্রমণই। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, ‘নিন্দা’ আর ‘সমালোচনা’ দুটো ভিন্ন শব্দ, তাদের দুটো ভিন্ন অর্থ। রবীন্দ্রনাথ নিন্দিতও হয়েছেন, সমালোচিতও হয়েছেন। ব্যক্তিগত শোক যেমন রবীন্দ্রনাথকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, আবার সেই শোক তাঁকে ঋদ্ধও করেছে — ঠিক তেমনই নিন্দা, ব্যক্তিগত স্তরে আক্রমণ, সমালোচনা তাঁকে আঘাত দিলেও সবকিছুই তাঁকে সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ‘আধুনিক সাহিত্য’ বইতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে লেখকসম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণে বৃথা চেষ্টা করিত তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি

দিত।' — এ কথা কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য লেখা হলেও এটি যেন তাঁর উপর ধেয়ে আসা সমালোচনার আত্মখণ্ডণ।

রবীন্দ্রনাথ গোড়াতেই বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি সমালোচকদের সমালোচনার অভিমুখটি। তাঁর আগের বাংলা সাহিত্যের পরিচিত রূপরেখা থেকে অনেকখানি সরে এসে তিনি যেভাবে লেখা শুরু করেছিলেন, শুধু পাঠক নয়, সাহিত্য-সমালোচকদের বোঝার জন্যও তা দুরূহ ছিল। কারণ তখনকার সাহিত্য বিশেষ করে বঙ্কিম-পূর্ববর্তী সাহিত্য ছিল সরাসরিতে বিশ্বাসী এবং আরেকটি ধারা ছিল পুরাণ-ভাবভক্তিমূলক। সমালোচিত হবেন জেনেও রবীন্দ্রনাথ পুরনো প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসে বাঙালি পাঠককে এক নতুন মাধুর্যময় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করালেন। বদলে দিলেন বাঙালি পাঠকের রুচি-পছন্দ। বদলে দিলেন বাংলা সাহিত্যের খোল-নলচে।

রবীন্দ্র-প্রতিভা ছিল বহুমুখী। সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখায় তিনি যে ভাব-ভাষা-ছন্দ-দর্শন-ফর্ম-আলোছায়া নিয়ে এলেন, তা সে যুগে ছিল সম্পূর্ণ নতুন, এ যুগেও অবশ্য অনুকরণীয়। তিনি নিজে তখন স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমালোচনার নামে সাহিত্যে অস্পষ্টতার অভিযোগ মিথ্যে নয়, কারণ এই ধারাটি তখনকার হিসেবে ছিল নবীনতম। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি বলছেন — 'এখন হইতে কাব্য সমালোচকদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এই একটা রব উঠিতেছিল যে আমি ভাঙা-ভাঙা ছন্দ ও আধো-আধো ভাষার কবি। সমস্তই আমার ধোঁওয়া-ধোঁওয়া ছায়া-ছায়া। কথাটা আমার পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক না-কেন, তাহা অমূলক নহে।' কিন্তু দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্র-সমালোচক থেকে সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক কিংবা তখনকার স্বনামধন্য অনেক ব্যক্তিত্বই সমালোচনার বাইরেও রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তি আক্রমণ করেছেন, বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন, নিকট অনেকেই তাঁর সঙ্গে দূরত্ব রচনা করেছেন।

সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং সাহিত্য-সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই প্রবন্ধের মুখ্য চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ এখানে পার্শ্বচরিত্র।

রবীন্দ্র-বিরোধিতার, সমালোচনার বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, নীচতা, ঈর্ষার মধ্যে দিয়ে। এ-সব কিছুই সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর রচনার নতুনত্ব, তাঁর পোশাক-আশাক, তাঁর বাচনভঙ্গি সবই শ্রীহীন মন্তব্যের মুখোমুখি হয়েছিল সেই যুগে। তখনকার দিনে জমিদাররা লেখক ভাড়া করতেন, সেই ভাড়া-করা কবিদের দিয়ে বই লিখিয়ে নিজের নামে ছাপাতেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদার-পুত্র এবং পরে স্বয়ং জমিদার হয়েও ওসব কবি-নিযুক্তিকরণের পথে না গিয়ে নিজেই কলম ধরলেন। তিনি সেভাবে 'প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত'ও হলেন না, আবার পাশ-টাশ দিয়ে অন্য জীবিকাও নিলেন না। বদলে এলেন নতুন এক সৃষ্টির ধারা নিয়ে। এই ধারার সঙ্গে বিদ্বজ্জন ও সাধারণ কোনও ধরনেরই পাঠক এবং সমালোচকদের পরিচয় না থাকায় তাঁরা সেই নবীন সাহিত্য এবং তার স্রষ্টাকে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাই তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিরুদ্ধতার মাধ্যমে তাঁদের অসহিষ্ণুতা-অসূয়া-অশ্রদ্ধা-অবজ্ঞা জানাতে লাগলেন।

বলতে গেলে ১৮৮৫ থেকে মোটামুটি রবীন্দ্র-বিরোধিতার সূচনা। ওই বছর ৫ মাঘ সিটি কলেজে রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকার মাঘ সংখ্যার প্রকাশিত হয়। ওই প্রবন্ধটির একটি সমালোচনা বেরোয় 'প্রবাহ' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায়। সমালোচক ছিলেন মহেন্দ্রনাথ রায়। তবে 'শ্রীশিঃ' ছদ্মনামে এই সমালোচনার যোগ্য প্রতিবাদ দেন কেউ একজন। সেই শুরু।

তারপর যাঁর নাম আসে, তিনি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। স্বভাবে তিনি ছিলেন নীচ এবং নিষ্ঠুর। তিনি

যেন তখনকার বাঙালি পাঠকের প্রতিনিধি হয়ে রবীন্দ্র-বিদ্বেষকে বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। আবার সেই সময় গোঁড়া হিন্দুরা ব্রাহ্মদের প্রচণ্ডভাবে অপছন্দ করত, কালীপ্রসন্ন এদেরও মুখ হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতায়। তাঁর রুচি ছিল নিম্নমানের। ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করতে গিয়ে হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের স্ত্রীকে ব্যাভিচারিণী ইঙ্গিত দিয়ে কবিতা লেখেন এবং তার জন্য কারাদণ্ডও হয়। তাতেও তিনি শিক্ষা পাননি বা দমেননি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও ব্যঙ্গের ছড়া বাঁধেন —

'আয় তোরা কে দেখতে যাবি
ঠাকুরবাড়ির মস্ত কবি!!
হায় রে কপাল, হায় রে অর্থ!
যার নাই তার সকল ব্যর্থ

উড়িস নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা,
তোর বক্ বকম্ আর ফোঁস ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা।
তাও ছাপালি গ্রন্থ হল,
নগদ মূল্য এক টাকা!!'

রবীন্দ্রনাথ নামের মনীষার বিরুদ্ধে বিরোধিতা ছিল কখনও সাময়িক, কখনও দীর্ঘস্থায়ী। দ্বন্দ্ব সে অর্থে হয়নি। মূলত রবীন্দ্রনাথের নীরবতার জন্যই বিরোধিতা দ্বন্দ্ব পর্যন্ত গড়ায়নি। তিনি সব আত্মস্থ করে নিতে পারতেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করে কখনও কখনও কিছু প্রতিবাদ করেছেন মাত্র; কিন্তু বাগবিতণ্ডায় ছিল তাঁর অনীহা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রবীন্দ্র-বিরোধিতা

রবীন্দ্র-সমালোচনা ও বিরোধিতার পথের অগ্রগণ্য পথিক ছিলেন নাটককার-গীতিকার-কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই সমসাময়িক (১৮৬৩-১৯১৩)। রবীন্দ্রনাথের মতো অতটা না হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও সুবংশজাত। তিনিও পারিবারিক সূত্রে সাহিত্যচর্চার একটা ধারা এবং সাঙ্গীতিক পরিবেশ পেয়েছিলেন। তিনিও প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ছিলেন, যদিও পরে তাঁর ধর্মবিশ্বাস কিছুটা বাঁক নেয় — তিনি বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে পড়েন। বিদেশে পড়াশোনা করা দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশি সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বিদেশি সাহিত্যের রোমান্টিকতা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যে আলো-ছায়ার যে মাধুর্য তা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতেন। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অস্পষ্টতার যে অভিযোগ নিয়ে রবীন্দ্র বিরোধিতা শুরু, সেই অস্পষ্টতার অভিযোগ নিয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল সমালোচনার মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই বিরোধিতা ক্রমশ বিদ্বেষ এবং সরাসরি আক্রমণে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু এই বিরোধিতা-আক্রমণ কাম্য ছিল না। ১৮৮২-তে একই বছরে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের বই প্রকাশিত হয়েছিল — রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' আর দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্য্যগাথা' প্রথম ভাগ।

এইরকমই কোনও সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সখ্য শুরু। আর তাতে অনুঘটকের কাজ করেছে 'ভারতী' পত্রিকা। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে জানা যায়, 'ভারতী'র লেখা নির্বাচন-প্রকাশের সূত্রেই তাঁর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরিচয়। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, গোটা ঠাকুর পরিবারের সঙ্গেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রদ্ধামিশ্রিত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্ক অনেকদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাহিত্যিকদের আসরে একটি নিমন্ত্রণপত্র তার প্রমাণ।

বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র, 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পরবর্তীকালে যিনি ঘোরতর রবীন্দ্রবিরোধী হয়ে ওঠেন, তাঁর এক স্মৃতিচারণায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বজরায় একটি পার্টিতে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই পার্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথ, দু'জনের গানই গাওয়া হয়েছিল। অতুলপ্রসাদ সেনের লেখা জানাচ্ছে, 'খামখেয়ালি সভা'র মজলিসে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর হাসির গান নিয়ে সকলকে হাসাতেন, সকলে গানের কোরাসে যোগ দিতেন। আর সেই কোরাস দলের নেতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি'তেও। দ্বিজেন্দ্রলাল এক ব্যক্তির চাকরির সুপারিশও করেন রবীন্দ্রনাথের কাছে এবং সুপারিশটি ছিল কবিতায়।

১৮৯৩-তে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্য্যগাথা' কব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকার ১৩০১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কাব্যটির সমালোচনা করেছিলেন। এবং সেটি ছিল যথার্থ সমালোচনা, তার ভাল-মন্দ দুই দিকই সমানভাবে আলোচিত হয়েছিল। ১৮৯৭-তে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'বিরহ' নাটকটি উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকে। ১৮৯৯-এ দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আষাঢ়ে' প্রকাশ পায়। এটিরও সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। এইবারে কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সমালোচনার অপ্রিয় সত্যকে নিতে পারলেন না। ধরা যায়, তখন থেকেই একটা বিরূপতা তৈরি হচ্ছিলই তাঁর মনে।

১৩১১-তে বাংলার সাহিত্যিকদের নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্ণিমা মিলন সভা শুরু করেন। দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে এই সভা আয়োজিত হয়। এই 'পৌর্ণমাসী সভা'র প্রথম সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'সে যে আমার জননী রে' গানটি গেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায় চৌধুরীর লেখা থেকে জানা যায়, তখনকার স্বনামধন্য সাহিত্যিকরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। গল্পগুজব, হাসি-আনন্দ, গান-কবিতা ও শেষে খাওয়া-দাওয়া হয়। একেবারে শেষে রং খেলা। সবাই যখন রং খেলছিলেন, রবীন্দ্রনাথ শুভ্রবেশে দূর থেকে সেই রং খেলা দেখছিলেন। তা লক্ষ করে দ্বিজেন্দ্রলাল মুঠো-মুঠো আবির নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে রাঙিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথও এই ব্যাপারটি উপভোগ করেন। এই সভার আগেই তাঁদের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ওই রঙের অনুষ্ঠানে যেতে ইতস্তত করেননি।

বাস্তব-জীবনে সম্পর্কের এই রং অচিরেই বদলে যায়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রথম দুই কাব্যগ্রন্থের ভাল-মন্দ দুই দিক মিশিয়েই সমালোচনা করেন। তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের প্রতি আস্থাই ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের। ১৯০২-এ প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' কাব্যটি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই কাব্যগ্রন্থ রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাসম্পন্ন কবি বলে অভিহিতও করেন। তবু এই প্রশংসা দ্বিজেন্দ্রলালকে খুশি করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, রবীন্দ্রনাথ এরপর আর দ্বিজেন্দ্রলালের কোনও বইয়ের সমালোচনা করেননি। এমনকি, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে তাঁর 'বিরহ' নামের যে প্রহসনটি উৎসর্গ করেন, রবীন্দ্রনাথ সেই বই সম্পর্কেও নীরব ছিলেন।

অথচ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সমারোহের সঙ্গে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের

একসময় ব্যক্তিগত ধারণা হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক নিয়ে তাঁর নীরবতাই হয়ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রবীন্দ্র-বিদ্বেষের কারণ। তবে রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবনীকার দেবকুমার রায় চৌধুরী দুজনেই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যেখান থেকে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্কে ফাটল এবং রবীন্দ্র-বিরোধিতার সূচনা-পর্বটি পরিষ্কার বোঝা যায়। ১৩১১ বঙ্গাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় একটি বই প্রকাশিত হয়, যার নাম 'বঙ্গভাষার লেখক।' বইটিতে তখনকার অনেক বাঙালি লেখকের জীবনী সংকলিত হয়। সম্পাদকের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মকথায় লেখেন — 'এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।'

রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল বলছেন — এই নিরীহ প্রবন্ধটিই কয়েকমাস পরে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে উত্যক্ত করে তোলে। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকারের লেখাতেও এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বইটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনবৃত্তান্ত স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা পড়ে উত্তেজিত-বিরক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। যদিও এই চিঠির বয়ান জানা যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথ এ চিঠি 'পাবলিক' করেননি, তিনি নিজের কাছেই রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এ চিঠিতে ব্যথিত হন। ওই বছর ২৩ বৈশাখ ছ'পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ চিঠিতে দ্বিজেন্দ্রলালের চিঠির উত্তর দেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের চিঠির বয়ানে তাঁর ভদ্রতাবোধ, সংযম ফুটে উঠেছে। তবে তিনি যে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, তার থেকে বোঝা যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগগুলি হল — রবীন্দ্রনাথ স্তাবক দ্বারা ঘিরে থাকেন, ঠাকুর পরিবার একটি অহংকৃত পরিবার, ঠাকুরবাড়িতে নিজেদের নাটকই করা হয়, যা বিজ্ঞাপনেরই নামান্তর, আত্মজীবনীতে রবীন্দ্রনাথের অহংকার প্রকাশিত, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কবিতার advertise করেন ইত্যাদি।

তবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে চিঠিটি শেষমেশ রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়েছিলেন কিনা সেটা খুব পরিষ্কার নয়। কারণ সেই চিঠি বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায় আছে। এই চিঠির দেওয়া নেওয়ার সময়ই কার্তিক সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল 'কাব্যে অভিব্যক্তি' নামে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে অস্পষ্ট, দুর্নীতিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করলেন। এবং উদাহরণ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি। কৃষিবিদ্ দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে সাহিত্যিক হয়েও কাব্যের কাল্পনিকতার কথা ভুলে 'সোনার তরী' সম্বন্ধে লিখলেন — 'কৃষক আউশ ধান কাটিতেছে বর্ষাকালে, শ্রাবণ মাসে। বর্ষাকালে কেহই ধান কাটে না; বর্ষাকালে ধান্য রোপন করে।'

এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল আরও অভিযোগ করলেন — 'যদি স্পষ্ট করিয়া না লিখিতে পারে সে আপনার অক্ষমতা, তাহাতে গর্ব্ব করিবার কিছু নাই। অস্পষ্ট হইলেই গভীর হয় না; কারণ ডোবার পঙ্কিল জলও অস্পষ্ট। স্বচ্ছ হইলেও Shallow বা অগভীর হয় না; কারণ সমুদ্রের জলও স্বচ্ছ। অস্পষ্টতা লইয়া বাহাদুরী করিয়া বা 'Miraculous' দাবী করিয়া স্পষ্ট কবিদের ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ, গুণ নহে।' দীনেশচন্দ্র সেনকে এই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তাঁর কাব্য সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল যে সকল অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা নিয়ে প্রতিবাদ করার কিছু নেই। এর থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ বারবার বিরোধে ইতি টানতে চেয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল অশ্লীলতার অভিযোগ এনে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কে বলেছিলেন — 'এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।' রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতাকে আক্রমণ করেই দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষান্ত হননি। এরপর তিনি সরাসরি ব্যক্তি আক্রমণ করলেন। রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে 'আনন্দ বিদায়' নামে একটি প্যারডি জাতীয়

প্রহসন লিখলেন। ১৩১৯-এ নাটকটি স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল। তবে শুধু প্রথম দৃশ্য নির্বিঘ্নে শেষ হলেও, দ্বিতীয় দৃশ্য আর অভিনীত হয়নি। শুরু হয়েছিল ভাঙচুর। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই আক্রমণ, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ রবীন্দ্র-ভক্তদের যেমন বিক্ষুব্ধ করেছিল, তেমনই দ্বিজেন্দ্র-ভক্তরাও দ্বিজেন্দ্রলালের এই নীচতায় ব্যথিত-বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালও অপমানিত হয়েছিলেন। তাঁকে স্টার থিয়েটারের লোকজন পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ঘটনার জন্য অনুতপ্ত বা অনুশোচিত হয়েছিলেন কিনা এর কোনও হদিশ পাওয়া যায় না। তবে এ যে তাঁকে ভেতরে দগ্ধ করেছিল, এ বিষয়ে নিশ্চিত। স্ত্রীর মৃত্যু, একাকিত্ব — এরপর তিনি আর বেশিদিন বাঁচেননি। ১৯১৩-এর ১৭ মে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবার দু'মাস আগে তিনি সব বিরোধিতার ঊর্ধ্বে চলে যান।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই রবীন্দ্র বিরোধিতা, আক্রোশ-ঈর্ষা, চাপান-উতোর যখন তুঙ্গে, তখন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ক্ষিতিমোহন সেনকে চিঠিতে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) লিখছেন — 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রণীত ইংরেজি শিক্ষার ৩ খানি বই আপনার কাছে পাঠাই যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে বিদ্যালয়ে ধরাইবেন। অজিত সেন এ বইয়ের প্রতি অবজ্ঞা না করেন বা মনে কোনও বিরুদ্ধতা না রাখেন। সুবিচার করিয়া যেটি ভালো বোধ করেন তাহাই করিবেন সত্যেশ্বরকেও দেখাইবেন। হয়ত ইংরেজি সোপানের চেয়ে ইহা কাজের হইতে পারে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ইংরেজি সোপান বইটি রবীন্দ্রনাথেরই লেখা।

দ্বিজেন্দ্রলালের অকাল মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রয়াণের পর D. L. Roy Memorial Fund তৈরিতে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্মরণ-সভায় তিনি উপস্থিত থাকতে না পারলেও, দ্বিজেন্দ্রলালের স্মরণে তাঁর লেখা প্রবন্ধটি পাঠ করেন প্রমথ চৌধুরী। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাবে ছিলেন একরোখা এবং অপ্রিয় বলতে পিছপা না হওয়া ব্যক্তিত্ব, তাঁর মধ্যে ঈর্ষার যে কীট বাসা বেঁধেছিল, তার থেকেই তিনি খেয়ালবশে এই রবীন্দ্র-বিরোধিতা করতে থাকেন। না হলে তিনিও কিন্তু স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। তিনি বিশ্বাস করতেন, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পাওয়া উচিত। তাঁর এই বিশ্বাস ফলপ্রসূ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের নোবেলপ্রাপ্তি তাঁর আর দেখে যাওয়া হয়নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র স্বনামধন্য দিলীপকুমার রায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহধন্য। দিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণ' বইতে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের এই মনান্তর নিয়ে নিরপেক্ষভাবে লেখেন। তিনি তাঁর পিতাকে 'কানপাতলা' বলতে দ্বিধা করেননি এবং কয়েকটি কপট বন্ধু'র প্রভাবকে এর জন্য তিনি দায়ী করেছেন। তিনি তাঁর পিতার ভুলকে যেমন স্বীকার করেছেন, তেমনই রবীন্দ্রনাথের সংযমী মনোভাবের প্রশংসা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে একটি চিঠিতে বলেছিলেন — 'তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি। সে কথা জানিয়ে তাঁকে ইংলণ্ড থেকে আমি পত্র লিখেছিলেম, শুনেছি সে-পত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় পেয়েছিলেন এবং তার উত্তর লিখেছিলেন। সে-উত্তর আমার হাতে পৌঁছয়নি।'

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্মৃতি পূজা' প্রবন্ধে লেখেন — 'তাঁর [দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের] মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি দু'একখানি পত্র লিখতে ব্যস্ত ছিলেন — তার মধ্যে আমার ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের নামে একটি পত্র। সেই লেখা সমাপ্ত হবার পরক্ষণেই যেন হঠাৎ তাঁর উপর বজ্রপাত হল তারপর যারা কাছে ছিল, তারা এসে তার ওপর ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে লাগল — তিনি যে লেখাগুলি লিখে গিয়েছিলেন, সব নষ্ট হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার নামটি কেবল পড়বার মতো ছিল — ভিতরকার আর পাওয়া গেল না। এই দুই কবির মধ্যে কিছুকাল মতান্তর মনান্তর ঘটেছিল — এই পত্রই বুঝি বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনের চেষ্টা — বিদ্রোহের পরে এই সন্ধিপত্র। কিন্তু তাঁর

বাল্যবন্ধুর প্রতি উদ্দিষ্ট এই শেষ কথাগুলি চিরদিনের জন্য কালসাগরে বিলীন হয়ে গেল, কি আপশোষ!'
এ কি আমাদেরও কম আপশোস?

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও রবীন্দ্রনাথ : 'সাহিত্য'-র আঙিনায়

'সমালোচনা' শব্দটি ভাঙলে 'সম' এবং 'আলোচনা' দুটি শব্দ বেরোয় অর্থাৎ নিন্দা, প্রশংসা দুই-ই। এইদিক থেকে রবীন্দ্র-সমালোচনার অন্যতম ব্যাক্তিত্ব ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। যদিও তাঁর সমালোচনায় প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই বেশি জায়গা পেত। তবে তাঁর সমালোচনায় ব্যক্তি-আক্রমণ সেভাবে ছিল না, রবীন্দ্র-সাহিত্যকে যুক্তি দিয়ে দেখাতে যেতেন তিনি। সুরেশচন্দ্র ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এক ধরনের ঈর্ষা এই সমালোচককে ক্রমে নিন্দুক ও রবীন্দ্র-বিরোধী করে তোলে।

সুরেশচন্দ্রর মুখ থেকেই শোনা যাক এই বিরোধিতার অন্তঃসলিলা কারণটি। তিনি এক সন্ধ্যায় কিছুটা তরলের প্রভাবে বলেছিলেন — 'সত্যি কথাটা বল্ব? আমরা ভাবতাম সবাই বাংলা লিখছি, ইংরেজির ধার ১২৯৭ বঙ্গাব্দে ধারিনে, সুতরাং সবাই এক। একদিন বুঝতে পারলুম যে, তা নয়, তিনি অনেক ওপরে। এটা সহ্য হল না' — বলে সমাজপতি বুকে হাত দেখিয়েছিলেন, যন্ত্রণাটা ঠিক কোথায়। এটিই যে রবীন্দ্র-নিন্দার মূল কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রথমদিকে সুরেশচন্দ্র সমালোচনার ক্ষেত্রে যেমন নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন, প্রশংসাতেও ছিলেন অকুণ্ঠচিত্ত। সুরেশচন্দ্রও দ্বিজেন্দ্রলালের মতো রবীন্দ্র-কাব্যে অস্পষ্টতার অভিযোগ এনেছিলেন। যেমন কবির 'দুঃসময়' কবিতাটি সম্পর্কে বলছেন — 'দুঃসময় নামক দুর্বোধ্য কবিতাটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ইহাতে কবিত্ব পরিচয় আদৌ নাই।' আবার 'মদন ভস্মের পূর্বে' ও 'মদন ভস্মের পর' দুইটি খণ্ড কবিতা, কিন্তু পরস্পরের যোগসূত্রে সম্বন্ধ। এই কবিতা যুগলের ছন্দ ও ধ্বনি পরম রমণীয়।' এই দুটি সমালোচনায় দেখা যাচ্ছে তিনি দোষ ও গুণ দুইয়ের কথাই বলেছেন। এই সমালোচনা দুটি ১৩০৫-এর 'ভারতী' পত্রিকায় যথাক্রমে বৈশাখ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ভারতীতে সুরেশচন্দ্রর সমালোচনা প্রকাশ পেলেও 'সাহিত্য' নামের পত্রিকাকে মাঝে রেখেই সুরেশচন্দ্রই বিরোধের সূত্রপাত করেন।

১২৯৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'সাহিত্য' পত্রিকার পথচলা শুরু। পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। এই পত্রিকাতেই মূলত প্রকাশিত হত রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা। এই বিভাগের সূত্রপাত সমাজপতির হাতেই ১৩০০ বঙ্গাব্দে। এই বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল, সেই সময়ের সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনার সমালোচনা করা। ১৩০০ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩২৭ পর্যন্ত মাসিক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে সুরেশচন্দ্র মোট ২১৫টি রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা করেন।

'সাহিত্য' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের মোট ৫টি রচনা প্রকাশিত হয়। রচনাগুলি হল যথাক্রমে — 'লেখার নমুনা', 'মেঘদূত', 'প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব', 'সোনার বাঁধনঃ কবিতা', 'গান'। এছাড়া তাঁর কিছু প্রতিবাদমূলক রচনা ও চিঠিপত্র এখানে প্রকাশ পেয়েছিল। ১২৯৯ সংখ্যায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে সুরেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মনোমালিন্য শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্র-সমালোচক সুরেশচন্দ্র শুধুই যে ব্যক্তিগত ভাবে সমালোচনার নামে মাঝেমধ্যে নিন্দাও করেছেন তাই নয়, তিনি অন্যত্র 'সোনার তরী'র অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেও সেই কবিতা নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিরূপ মন্তব্য করলে, তিনি তাঁকেও সমর্থন জানিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রনাথকে অস্পষ্টতা দোষের

অভিযোগ এনে 'কাব্যের অভিব্যক্তি' নামের প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন ১৩১৩-র কার্তিক সংখ্যায়। ১৩১৬-তে দ্বিজেন্দ্রলালের আরেকটি রবীন্দ্র-বিরোধী প্রবন্ধ 'কাব্যে নীতি' প্রকাশ করেন। কৃষ্ণভামিনী দেবীর রবীন্দ্র-বিরোধী প্রবন্ধগুলি তিনি উৎসাহের সঙ্গে সাহিত্য পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করেন।

আসলে সুরেশচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম বিরোধী এবং রক্ষণশীল হিন্দু। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষ তাই সমালোচনার মধ্যে দিয়ে প্রকটিত হত। এই ঈর্ষা, এই বিদ্বেষ সমাজপতিকে রবীন্দ্রকাব্যের অপব্যাখ্যা করিয়েও ছেড়েছে। সমালোচনার অভিমুখ ছিল সমাজপতির নীতিজ্ঞান। যেখানেই তাঁর নীতিবোধ-রক্ষণশীলতা নাড়া খেয়েছে, সেখানেই তিনি কঠোর সমালোচক। দীর্ঘ সাতাশ বছর রবীন্দ্র-সমালোচনা, রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেই কাটিয়েছেন 'সাহিত্য' পত্রিকাকে অবলম্বন করে। তাঁর সমালোচনার অভিমুখটিতে অসহিষ্ণুতা-ব্যক্তি আক্রমণ বেশি অগ্রাধিকার পাওয়ায় তিনি বারবার সাধনা, প্রদীপ, প্রবাসী, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন।

সাহিত্য পত্রিকার প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার সুরেশচন্দ্রের বাড়িতে গেছেন। আবার শেষপর্বে সুরেশচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' থেকে 'আগমনী' বার্ষিকীর জন্য 'মাতৃবন্দনা' নামে কয়েকটি কবিতাও লিখে দেন। সম্পর্কের এই চড়াই-উৎরাইয়ের কারণ ছিল সুরেশচন্দ্রের দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ও রবীন্দ্রনাথের দর্শনের তুমুল পার্থক্য। সুরেশচন্দ্র মনে করতেন, সৌন্দর্য সৃষ্টি নয়, সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য হল হিতসাধন। যার ফলে তিনি তাঁর মৌলিক গোঁড়ামির উপরে উঠতে না পেরে চোখের বালিকে আক্রমণ করেছেন। বিরূপ সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্র-কাব্যের।

রবীন্দ্রনাথ দু-একটি ছাড়া সুরেশচন্দ্রের সমালোচনার কোনও যোগ্য প্রত্যুত্তর দেননি। সুরেশচন্দ্র নিন্দা করলেও কিছু কিছু লেখায় কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছেন। তাঁর নিজের লেখা 'প্রাইভেট টিউটর'-এ রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করেছেন, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ব্যবহার করেছেন। সুরেশচন্দ্রের সমালোচনা পাঠক সমর্থন না করলেও এই সমালোচনা, এই বিরোধী আলোচনা সমালোচনার ক্ষেত্রকে নিরপেক্ষ দায়িত্বশীল হতে শিখিয়েছিল।

মনীষার দ্বন্দ্ব যুগে-যুগে। রবীন্দ্রনাথও সম্মুখীন হয়েছেন এই দ্বন্দ্বের। কখনও তা বিপিনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, কখনও পাউণ্ড-ইয়েটস। তবে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনে কোনওদিন কোনও সংঘাতে জড়াননি। তাঁর একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন — 'যার কাছ থেকে আমি কোনো ক্ষোভ পাই তার সম্বন্ধে আমি সর্বপ্রযত্নে আত্মসংবরণ করে থাকি।' রবীন্দ্রনাথ কোনওদিনই কবির লড়াইয়ে নামেন নি। তিনি বরাবর অপ্রিয়তাকে পাশ কাটিয়ে চলেছেন। কাঁটায় বিদ্ধ হলেও যন্ত্রণা লুকিয়েছেন। তাঁর রচনাই যেন তাঁর কথা গেয়েছে —

'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে'।

সাবর্ণি চট্টোপাধ্যায় : প্রাবন্ধিক, গল্পকার, গ্রন্থ সমালোচক।